কোথাকার ছবি

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

বাড়িটার আট ভাগের ছ-ভাগই ভেঙে নামানো হয়ে গেছে, বাকি আছে শুধু এই হলঘরটা। হলঘরটায় এককালে একটা মস্ত ঝাড়লণ্ঠন ঝুলত। এখন চারপাশ থেকে রোদ ঢুকেই আলোয় স্নান করাচ্ছে ঘরটাকে। দু-বিঘে খোলা জমির মধ্যে কীরকম আনমনে দাঁড়িয়ে আছে হলটা। শাবল আর গাঁইতিতে ধ্বস্ত হওয়ার অপেক্ষায়। তারপর...

পাশ থেকে গলা ভেসে এল প্রোমোটার মাংতুরামের, 'কিবল আপনার জন্যই এই হলটা এখনও ভাঙলাম না, অরুণবাবু হাঁ, আপনি লিখলেন কি সবুর করার জন্য, তাই সবুর করলাম। আপনি মানী রাইটার আছেন, তাই আপনাকে একবার আপনার বার্থপ্লেসটা দেখিয়ে দিতে চাইলাম, হাঁ। আমাদের কমুনিটির মধ্যে রাইটার লোগদের জন্য খুব রেসপেক্ট আছে, হাঁ। এখন দেখে লিন কি আপনার কোনো জিনিস আপনি লিবেন কি না।

অরুণ হাঁ করে তাকিয়েছিল হলের দেওয়ালে ধূলিধূসর হয়ে ঝুলে থাকা বিশাল পেন্টিংটার দিকে। তিন ফুট উচ্চতা আর ছ-ফুট দৈর্ঘ্যের কালো ফ্রেমে বাঁধানো

সাহেবের আঁকা ছবিটা জন্ম থেকে দেখে এসেছে অরুণ। কে, কবে ছবিটা আমদানি করেছিল অরুণের ধারণা নেই, তবে বাবাকে ও কখননো সখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে উপভোগ করতে দেখেছে শৈশবে।

আর উপভোগ করার মতনই ছবিটা, অন্তত এরকম ধূলিধূসর হওয়ার আগে অবধি তাই ছিল। সাহেবের আঁকা ছবিটা একটা পার্টি সিন। ভিক্টোরীয় বা তারও আগের কোনো যুগের এক বিপুল ভোজ ও নৃত্যসভার দৃশ্য। পরমাসুন্দরী সব মেমসাহেব আর নায়কোচিত চেহারার সব সাহেবদের মিলনসভা। কারও হাতে পানীয়ের গেলাস, কারও হাতে আঙুর, কোনো সাহেবের বাহুবন্ধনে কোনো রূপসী চোখ বুজে এলিয়ে আছে, অনেকেই হাত ও কোমর ধরাধরি করে বল নাচে ব্যস্ত। এক-আধজন পুরুষ আপন মনে দীর্ঘ, সরু পাইপে তামাক সেবনে বাঁদ, কোনো রমণী আবার আলতো করে চুমু দিচ্ছেন প্রিয় পুরুষের ঠোঁটে। আলো ঝলমলে সভায় নারী-পুরুষের পোশাকে রঙের উৎসব চলছে। কেবল একটি কোণে একটি যুবতী কীরকম মলিন মুখে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে। অরুণের মনে পড়ল, বাল্যে কীভাবে ও চুপিসাড়ে এসে দাঁড়াত ছবিটার নীচে, আর আস্তে আস্তে কী যেন একটা ঘটে যেতে ওর শরীরে, মনে। ওর মনে হত, ও নিজেও ওই ছবির বাইরে নয়। ছবিরই একটা মানুষ ও, বাইরে এসে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অরুণের ঘোর কাটল মাংতুরামের কথায়, কী অরুণবাবু, ছবিটা আপনি লিবেন? তো লিয়েই যান। উ দিয়ে আমার কোনও পারপাস সার্ভ হবে না। আপনি রাইটার লোগ, আপনি উর মিনিং বাহির করতে পারবেন। বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল মাংতুরাম, এ লখিয়া, ই পিকচারকো উতারো অউর সাহেবকো গাড়িমে ডাল দো। দেখ উসকো ডামিজ না হোয়। মেহেঙ্গা পিকচার হৈ।

অরুণের মাথায় খেলল না, এই এত বড়ো ছবিটা ও ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে কোথায় রাখবে। ঠিক এই ভেবেই তো আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ওরা ছবিটা ফেলেই চলে গিয়েছিল ফ্ল্যাটবাড়িতে। জন্মভিটের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ সত্ত্বেও মধ্য কলকাতার এই বাড়িটায় আর কখনো পা রাখেনি অরুণ। মাঝেমধ্যে এ পাড়া দিয়ে যেতে যেতে হয়তো আড়চোখে চেয়েছে বাড়িটার দিকে আর লজ্জায় চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। অত সুন্দর বাংলো প্যাটার্নের বাড়িটার কী দশাই না হয়েছে মাড়োয়ারিদের হাতে। বাড়িটার স্টাইলই ঝেড়ে বদলে ফেলে সেটাকে একটা কুৎসিত কারখানার চেহারা দিয়েছে। আর এতদিন পর চিঠি দিয়ে জানাল যে, বাড়িটা ভেঙে সেখানে আটতলা ফ্ল্যাটবাড়ি তুলবে প্রোমোটার মাংতুরাম। অরুণবাবু চাইলে এসে একবার শেষ দেখা দেখে যেতে পারেন ওঁর জন্মভিটেকে।

স্মৃতির বাড়িটাকে দেখতে আসার সময় অরুণ কল্পনাও করতে পারেনি, হলঘরের ওই পেন্টিংটা আজও টিকে থাকবে মাড়োয়ারিদের নজর এড়িয়ে। একটু অবাকই হয়েছিল অরুণ—অ্যাদ্দিনে কেউ এটাকে পেড়ে নামিয়ে দেখতে চাইল না, ছবিটাকে বেচা যায় কি না! উলটে আজ মাংতুরাম যত্ন করে সেটাকে নামাচ্ছে অরুণের গাড়িতে তুলে দেবে বলে। অতবড়ো ছবি তো গাড়ির রুফে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। আর সে যেমন করে হোক নিয়ে গেলেও ওটাকে অরুণ ঝোলাবে কোন দেওয়ালে? ওর ফ্ল্যাটে তো একটাও দেওয়াল নেই ছবিটিকে ধারণ করার।

তবু ছবিটা ওকে নিতেই হবে। ছবিটার দিকে তাকালেই বাবার স্মৃতি ভেসে আসে। বাবার মৃত্যুর দিনেও ওঁর দেহটাকে শোওয়ানো হয়েছিল এই হলঘরে, এই ছবিটার নীচে। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বালক অরুণের কেবলই মনে হচ্ছিল, হঠাৎ করে বাবা হয়তো দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাতে শুরু করবেন ছবিটার দিকে।

কিন্তু ছবিটার আসল রোমাঞ্চ বিস্তার আরম্ভ হল বাবার মৃত্যুর পর থেকে। অরুণ একলা বোধ করলে, মন খারাপ হলে পর নিঃশব্দে দাঁড়াত গিয়ে ছবিটার নীচে। চোখ তুলে চেয়ে রইত লাল-নীল-হলুদের বন্যায় ভেসে যাওয়া নারী-পুরুষের দিকে। নীরব ছবিতে আস্তে আস্তে বেজে উঠত বাজনার ধ্বনি, হাসির হররা, নাচের ছন্দ, আর খানিক পরে অরুণের মনে হত, সেও ওই পার্টির অংশ। শুধু পার্টিতে হাজির থেকেও ওই পার্টি বা পরিবেশের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা থেকে যেত ওই মলিন মুখের একলা মেয়েটি। যেন কেউ ওকে নাচতে ডাকেনি, পানীয় অফার করেনি বা কাছে গিয়ে যেচে কথা বলেনি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে অরুণ আবিষ্কার করল যে, ছবিটার মধ্যে ওই মেয়েটার দিকেই যেন ওর টান বেশি। গোটা পার্টির লোকজনকে ছেড়ে ও কেবল ওই মেয়েটাকেই দেখে। এবং পার্টির ধ্বনির বদলে মন দিয়ে শোনে মেয়েটির অনুচ্চারিত নিঃশব্দ সংলাপ এবং এভাবে দেখতে দেখতেই একদিন অরুণের মনে হল, মেয়েটি ওর কানের মধ্যে ফিসফিস করে বলছে, আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও প্লিজ!

প্রথম মুহূর্তে গায়ে কাঁটা দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল অরুণ। সর্বনাশ! এ কী শুনল ও ছবির থেকে? একটু পরে সংবিৎ ফিরে পেয়ে ও ছবির দেওয়াল থেকে দূরে সরে গিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। ছবিটা যেমন থাকার তেমনই আছে। মেয়েটাও সেই মৌন, বিষণ্ণ, নিঃসঙ্গ, সভার এক কোণে। অরুণ নিজের মনে একটু হেসে হল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর বহুদিন সেটির কাছে যায়নি।

ছবিটা ওর গাড়ির মাথায় শুইয়ে বেঁধে দিয়েছে লখিয়া। মাংতুরাম বলল, এবার আমি বাড়িটা পুরাই ডিমোলিশ করতে পারব। আর নতুন বিল্ডিং হলে আরেকবার আপনার পায়ের ধুলা দিবেন ইখানে।

অরুণ ‘আচ্ছা। নমস্কার!’ বলে গাড়িতে এসে বসল। মিন্টো রো-এর বাঁকটা ঘুরতেই ছবির ওই স্মৃতিগুলো ফের কেঁপে এল মাথায়। ও সিগারেট ধরিয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে বসে রইল। ড্রাইভারকে একবারটি শুধু বলল, নন্দ, বাড়ি চলল। আজ অফিস যাব না।

অনেক দিন পর ফের যখন ছবিটার নীচে দাঁড়িয়েছিল অরুণ, ওর খেয়াল হল যে, সেটি আর আগের মতো মিশছে না ওর সঙ্গে। ছবিটা আবার কীরকম ছবি হয়ে গেছে। লোকজনের হাসি, নাচের পদধ্বনি, পিয়ানো কিংবা বেহালার সুর উপচে এসে পড়ছে না ওর কানে। ছবির সাহেব-মেমরা যে-যার জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, ছবিতে যেমন থাকে। আর মেয়েটিও সেই আগের মতো ভিড়ের এক কোণে হারিয়ে আছে সবার অলক্ষ্যে। অরুণের ভয় হল, ও আর কোনোদিন ওই ছবির উৎসবে ঢুকে পড়তে পারবে না। আর এইটা মনে হতেই গলার কাছটায় কেমন যেন কান্না কান্না ব্যথা তৈরি হল। ও চট করে একটা লম্বা টুল জোগাড় করে তাতে দাঁড়িয়ে ছবিটার মুখোমুখি হল। ছবির কাচের ওপর নাক ঠেকিয়ে চোখ বড়ো বড়ো করে দেখতে লাগল দুঃখী মেয়েটিকে। সত্যিই ওর চোখে কি জল আছে? নাকি কারও বিফল প্রতীক্ষায় ঠায় দাঁড়িয়ে ও উৎসবের এক কোণে?

‘বিফল প্রতীক্ষা’ কথাটা হালে ইস্কুলে শিখেছে অরুণ। কেন ভাবল ও এই কথাটাই, ও নিজেও জানে না। একটা দশ বছরের বালক কী জানে বিফল প্রতীক্ষার ব্যাপারে। আর কেনই বা ভাবল মেয়েটা কারও অপেক্ষায় আছে? এই এতশত ভাবতে ভাবতে অরুণ ফের একটু চোখ চালাল ছবির অন্যত্র। আর তখনই চোখে পড়ল, ওর ছবির অন্য প্রান্তে এক হিংস্র চেহারার যুবক, যে দুই ভয়ংকর লোলুপ চোখে পান করছে ছবির মেয়েটির রূপ। মেয়েটি যেমন সভার সব আনন্দ-উত্তেজনা ভুলে ডুবে আছে নিজের দুঃখে, এই লোকটিও যেন সব উৎসবের ফাঁকে গভীর প্রতীক্ষায় এই মেয়েটির জন্য। অরুণ যতই

দেখে সেই লোকটিকে, ওর হিংস্রতা যেন একটু একটু করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষে একসময় মনেই হল অরুণের, লোকটা সত্যি সত্যি এবার একটু একটু করে এগোচ্ছে মেয়েটির দিকে।

সর্বনাশ! লোকটা তো তা হলে ধরেই ফেলবে মেয়েটাকে। আর মেয়েটাই বা পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? আর থাকতে পারছে না অরুণ, ও দুম দুম করে ছবির কাচে ঘুসি মারতে লাগল যেখানে দাঁড়িয়ে (নাকি চলন্ত) লোকটা। তারপর হঠাৎ অন্ধকার!

চোখ খুলে অরুণ দেখল, ওর মা, কাকা, দাদা, দিদি-রা ওর মুখের উপর ঝুঁকে। পাশে বাড়ির ডাক্তার সামন্তবাবু। কাকা ওকে চোখ মেলতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বললেন, যাক, ভয় কেটে গেছে। এখন ওকে ফের ঘুম পাড়িয়ে দাও ডাক্তার।

দফায় দফায় কতবার কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল অরুণ, ওর জানা হয়নি। শেষে কাজের লোক চিন্তা একসময় একটু বকুনির ঝাঁঝে জিজ্ঞেস করেছিল, আচ্ছা, খোকাবাবু, তুমি টুলে চড়ে অত্তো বড় ছবিটা পাড়তে গিয়েছিলে কেন? ওটা ঘাড়ে পড়লে তুমি বাঁচতে? ফের যদি তুমি ওই ছবির কাছে গেছ তো তোমার একদিন কি আমার একদিন। অরুণ নিজের মধ্যে ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে অস্ফুট স্বরে বলেছিল, আচ্ছা।

অরুণের চটক ভাঙল ফ্ল্যাটে এসে। তিনজনে মিলে ধরাধরি করে ছবিটা এনে লাজুক লাজুক মুখে ও পৃথাকে বলল, মাংতুরাম বলে এক প্রোমোটার আমাদের বাড়িটা ভেঙে মাল্টিস্টোরিড তুলছে। বাবার এই ছবিটা ওই আমাকে নিয়ে আসতে বলল। ছেলেবেলায় যখন বাড়িটা বিক্রি হয়, ওটা নিয়ে রাখার কোনো জায়গা পাননি মা। তাই...

পৃথা দেওয়ালে ঠেকিয়ে দাঁড় করানো ছবিটা কিছুক্ষণ মন দিয়ে দেখে বলল, দারুণ ছবি, কিন্তু তবে একে রাখবে কোথায়? এতখানি দেওয়ালই তো এ ফ্ল্যাটে নেই। অরুণ মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, সমস্যা তো সেটাই। সাধে আর মা ছবিটা ছেড়ে এসেছিলেন। আবার প্রাণে ধরে বিক্রিও করতে পারেননি। পৃথা বলল, তা হলে? তা হলে আর কী? থাকুক আপাতত এই ডাইনিং প্লেসে, তারপর দেখা যাবে।

অমনি প্রতিবাদ করে উঠল পৃথা, না, না, তাই কি হয় নাকি? এত সুন্দর একটা জিনিস এভাবে পড়ে থাকবে। এটা বরং টিঙ্কর ঘরে ঠেস দিয়ে রাখা যাক এখন, পরে দেওয়াল বার করা যায় কি না দেখব।

অরুণ খুব খুশি হল মনে মনে। কারণ এরকম প্রস্তাব ও চাইছিল পৃথার কাছ থেকে আসুক। তখন ড্রাইভার নন্দ, কাজের লোক আশু আর অরুণ মিলে ছবিটা ফের ধরাধরি করে নিয়ে বসাল টিঙ্কর ঘরে। চার বছরের কন্যাটি তখন খেলনাপাতি সাজিয়ে বসেছিল, প্রকান্ড ছবিটা দেখে গোল গোল চোখে বলল, বাপরে, এ কী এনেছ বাপি? পিকচার?

অরুণ হাসতে হাসতে বলল, সাহেব-মেমদের পিকচার। দেখছে কীরকম ডান্স করছে? গাইছে। হাসছে।

টিঙ্কু ছবিটার সামনে হাঁটাহাঁটি করে খুঁটিয়ে সব দেখে হঠাৎ বলল, বাপি, ওই মেয়েটা কিন্তু হাসছে না। মেয়ের কথায় রীতিমতো চমকে গিয়েছিল অরুণ, কিন্তু কিছু একটা ওকে বলা দরকার বলে একটু কেশে নিয়ে বলল, তাতে কী? তুমি না হয় ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ওকে হাসাবে!

টিঙ্কু কোনো জবাব না দিয়ে ফের মন দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল, যেন বিশাল একটা ম্যাপ স্টাডি করছে।

রাতে যখন টিঙ্কু ওর ছোট্ট বিছানায় নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে আর পৃথা বসার ঘরের সোফায় টেবিল ল্যাম্পের আলোয় একমনে পড়ে চলেছে একটা শারদীয় সংখ্যা, অরুণ আস্তে আস্তে মেয়ের ঘরে ঢুকে টর্চের আলোয় খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ছবিটা। ছেলেবেলায় ছবির যে দুটো জিনিস দেখার কথা মনে আসেনি কখনো, সেই দু-জায়গায় প্রথমে আলো ফেলল অরুণ। প্রথমে শিল্পীর নামে। দেখল অ্যালফ্রেড নিউটন জন। না, এ নামের কোনো শিল্পীর কথা তো শোনেনি কখনো। তারপর ছবির টাইটেল–'দ্য আন এণ্ডিং পার্টি। অর্থাৎ অশেষ ভোজসভা। কিন্তু অশেষ কেন?

অরুণ এবার আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল গোটা ছবিটা, যদি কোনো সূত্র পায় শিরোনামটার। কিন্তু এ কী! সেই হিংস্র লোকটা তো আর তার জায়গায় নেই! কোথায় সে? আর ওই অসহায়, নিঃসঙ্গ মেয়েটিই বা কোথায়? দেখতে দেখতে ফের গান আর নাচের শব্দ পেতে শুরু করেছে অরুণ, জোরকদমে পার্টি চলছে, সাহেব-মেমরা আপন মেজাজে নেচে চলছে, কারও খেয়ালই নেই, সভার দুটো মানুষ কখন, কোথায় উধাও হয়েছে।

অরুণ সমস্ত ছবির ওপর টর্চ ঘোরাতে শুরু করেছে, কিন্তু কোথাও ওই দুটি প্রাণী নেই। হঠাৎ খেয়াল হল, এ কী, এক ধারের মোটা ভেলভেটের পর্দা ওভাবে ঝাপটাচ্ছে কেন? ওর পিছনে কী ঘটছে? অরুণ হাত দিয়ে পর্দাটা সরাতে গিয়ে বুঝল, ছবির কাচে হাত আটকে যাচ্ছে। পার্টি চলছে, সব নারী-পুরুষ নাচে-গানে বিভোর। কিন্তু পর্দাটাও ঝাপটাচ্ছে, নিশ্চয়ই সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটছে ওর আড়ালে। তা হলে কি ওই লোকটা ওই মেয়েটাকে...?

আর ভাবতে পারছিল না অরুণ, ওর ডান হাতে ধরা টর্চ দিয়ে দমাদ্দম মেরে কাচটাকে ভেঙে ও ছবির ভেলভেট পর্দাটা সরাতে গেল...কিন্তু হাত আটকে গেছে, দেখে পৃথা ওর হাতটা ধরে রেখে বলছে, কী হল তোমার? এত সুন্দর ছবিটাকে তুমি নষ্ট করে ফেলছ?

তাই তো! নখ দিয়ে আঁচড়ে ও একটা ছবির পর্দা সরাতে যাচ্ছিল কেন? তা কি যায়? উলটে কাচ ভাঙতে গিয়ে হাতের পাশটাও কেটেমেটে একাকার। গলগল করে রক্ত গড়াচ্ছে কড়ে আঙুলের পাশ বেয়ে।

অরুণের কোনো উত্তর জোগাল না, এই খ্যাপামির কী ব্যাখ্যা দেবে ও?

পরদিন নন্দ আসতে অরুণ বলল, নন্দ, ছবিটা আরেকবার গাড়িতে তুলতে হবে। অত বড়ো ছবি এভাবে এক কোণে ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

পাশ থেকে পৃথা বলল, তা হলে ছবিটা কি বেচে দেবেই ঠিক করলে? কথার উত্তর না দিয়ে অরুণ একবার হাঁটু গেড়ে বসল ছবিটার সামনে, দেখল দুঃখী মেয়েটি আর হিংস্র যুবকটি দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে যে-যার জায়গায়, যেন অরুণকে বোকা বানানোর জন্যই। হঠাৎ করে রক্ত চড়ে গেল ওর মাথায়। বলল, বেচব না তো কী করব? এই মাল ঝোলাবার জায়গা আছে বাড়িতে?

শুষ্ক গলায় পৃথা শুধু বলল, তা হলে আর এত ঝুঁকি নিয়ে বয়ে আনার কী দরকার ছিল? রাগ হজম করতে করতে অরুণ বলল, আমার বুদ্ধি!

ছবিটা বার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যখন, অরুণের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল টিঙ্কুর কথায়, পিকচারটা নিয়ে যাচ্ছ কেন বাপি? কী সুন্দর নাচ-গান হচ্ছে ওতে!

অরুণ বলল, দেখি, পার্টির একটা ছোট্ট ছবি এনে দেব তোমাকে। অ্যাতো বড়ো ছবি কোথায় রাখব বলো সোনা?

অফিসের পথে প্রথমেই স্টেনর-এর দোকানে নামল অরুণ ছবিটাকে নিলামে দেবে বলে। পরের দিন শনিবার, নিলামের দিন। ছবির দর রাখা হল দু-হাজার, তারপর যত দূর ওঠে উঠবে। কাগজপত্তর তৈরি হতেই অরুণ ফের রওনা হল অফিসের দিকে। মাথায় ঘুরছে একটা চিন্তা : টিঙ্কুর জন্য ফরাসি শিল্পী দুফি-র আঁকা কার্নিভালের একটা দৃশ্য কিনতে হবে। অক্সফোর্ড বুক শপ-এ দুফি-র প্রিন্ট পাওয়া অসুবিধে হবে না। দুফি-র ছবিগুলোর মধ্যে এমন সব রং, আঁকার এমন টঙ, এমন মেজাজ, তা ছোটো-বড়ো সবারই মন ভরিয়ে দেয়।

বাড়ি ফেরার পথে দুফি-র প্রিন্ট পেয়ে যেতে সত্যি খুব স্বস্তি আর আনন্দ হয়েছিল অরুণের। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি চাঞ্চল্য হল সোমবার অফিসের পথে স্টেনরে নামতে। এক গাল হেসে ম্যানেজার যখন বলল, আপনার ছবি তো দারুণ প্রফিট দিয়েছে, মিস্টার সেন?

অরুণ একটু অবাক হয়ে বলল, কীরকম?

-কীরকম মানে? নিট ষোলো হাজার টাকা!

—তাই বুঝি? কে কিনল?

-জেফার্সন ব্রাদার্সের আউটগোয়িং ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার আরবুথনট। বললেন, এরকম একটা ছবির জন্যই অপেক্ষা করছি এতদিন।

কমিশন কেটে টাকাগুলো গুনে অফিস যেতে যেতে ফের কীরকম উদাস হয়ে গেল অরুণ। কোত্থেকে যে কে ছবিটা ওদের বাড়িতে এনেছিল জানা নেই। এতকাল বেঘোরে পড়ে পড়ে ধুলো কুড়িয়েছে ছবিটা অন্যের ঘরে। অবশেষে অন্য আরেকজনের ঘরে চলে গেল অরুণকে এককাঁড়ি টাকা উপহার দিয়ে। ছেলেবেলার এই ছবি দেখতে দেখতে পড়ে যাওয়ার, ক-দিন আগে হাত কাটার সব ব্যথা, বেদনা এক নিমেষে উবে গেল ওর। আর কীরকম একটা মনখারাপ, মনখারাপ ভাব জাগল হঠাৎ। ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন কিছুটা বাল্যকালও হারিয়ে গেল অরুণের। ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা সিগারেট ধরাল।

অফিসের সাতকাজের মধ্যেও অবচেতনে যেন ছবিটা ঘোরাফেরা করছে মনে। অনেকগুলো টুকরো টুকরো প্রশ্ন ছড়িয়ে আছে মনের আনাচে-কানাচে। সেই সব প্রশ্ন আবার মিলেমিশে একটা মস্ত প্রশ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। শৈশব থেকে দেখে আসা ছবিটা বাস্তবিকই মোনালিসার রহস্যময় হাসি হাসছে ওর মনের আয়নায়। অরুণ একটা লেখা তৈরি করার জন্য বসেছিল, কিন্তু সাড়া পেল না। ও প্রধান সম্পাদকের ঘরে গিয়ে একটা অজুহাত দিল —শরীরটা ভালো নেই। লেখাটা কাল দিলে খুব দেরি হবে কি? সম্পাদকমশাই জানেন, এমন অজুহাতের লোক অরুণ নয়। উনি মুখে একটু ছদ্মচিন্তিত ভাব দেখিয়ে বললেন, না, না, শরীর খারাপ থাকলে আজ দেওয়ার দরকার নেই। তবে কাল পাওয়া যাবে তো? অরুণ বিগলিত স্বরে বলল, অবশ্যই! অবশ্যই!

অফিস থেকে বেরিয়ে অরুণ কিন্তু বাড়ি গেল না। ও রওনা হল ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে। ভেতরটা আনচান করছে। তলব করে দেখতে হবে অ্যালফ্রেড নিউটন জন শিল্পীটি কে, কবেকার কোথাকার? ওঁর কোনো ছবির মূল্য কী দাঁড়াতে পারে এবং ‘দ্য আনএণ্ডিং পার্টি’ ওঁর কোনো বিশ্রুত ছবি কি না।

কম বই ঘাঁটতে হয়নি অরুণকে, অধিকাংশ শিল্পের বইতে একটিবারের জন্যও কোনো উল্লেখ নেই অ্যালফ্রেড নিউটন জন-এর। ঘন্টা দুয়েক এভাবে ধস্তাধস্তির পর যখন হাল ছেড়ে দেওয়ার মুখে অরুণ, ওর খেয়াল হল দ্য আনএণ্ডিং পার্টি' ছবির নামে কোথাও কোনো এন্ট্রি পাওয়া যায় কি না, নগণ্য শিল্পীদেরও কোনো উল্লেখযোগ্য কাজের উল্লেখ থাকে ডিকশনারিতে। এইভাবে ইণ্ডেক্স দেখতে দেখতেই ও হঠাৎ পেয়ে গেল নামটা। তারপর ছবির বর্ণনা পড়তে গিয়ে বাক্যে বাক্যে হোঁচট খেতে লাগল। প্রথমেই পড়ল যে অমর ইংরেজ শিল্পী উইলিয়ম টার্নারের বন্ধু ছিলেন 'দ্য আনএণ্ডিং পার্টি' ছবির শিল্পী অ্যালফ্রেড নিউটন জন। একটা সময়ে নিউটন জনকে বর্ণনাও করা হত, উইলিয়ম টার্নার অব দ্য ড্রইং রুম' বলে। অর্থাৎ টার্নার তাঁর নদী, সমুদ্র, পর্বত ইত্যাদি প্রকৃতির ছবিতে যে রঙের জাদু ঘটাতেন, নিউটন জন সেটাই করতেন বসার ঘর, হলঘর, পার্টি ইত্যাদির চিত্রায়ণে। ওঁর সেরা ছবি 'দ্য আনএণ্ডিং পার্টি'-তে অবশ্য রঙের ও রেখার খেলার পাশাপাশি আরও একটা জাদু কাজ করেছে। কালো জাদু, ব্ল্যাক আর্ট, তুকতাক। তাঁর জীবনের এই শেষ ছবিতে তিনি এঁকেছেন তাঁর প্রেয়সীকে, যাঁকে তিনি জীবনে পাননি। ছবিতে তিনি নিজেকেও এঁকেছেন এক হিংস্র, ক্ষুধার্ত যুবক হিসেবে। ছবির রং তিনি তৈরি করেছিলেন মন্ত্রপূত জল ও রক্ত মিশিয়ে। মাত্র দু-টি প্রদীপের আলোয় রাতের অন্ধকারে তিনি এই ছবি আঁকতেন। দেড় বছর ধরে এই ছবিটা নিয়ে পড়েছিলেন তিনি, যে জন্য ছবিটা টার্নার ঠাট্টা করে বন্ধুর ছবির নামকরণ করেন 'অশেষ ভোজসভা।

ছবিটা কিন্তু বিক্রি করেননি নিউটন জন। তিনি এটি দান করেছিলেন তাঁর প্রেয়সীকে। শোনা যায় এই ছবি বাড়িতে টাঙানোর কিছুদিন পর থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে মহিলার এবং তাঁর স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তখন লণ্ডনের শিল্পমহলে জোর গুজব ছড়ায় আলফ্রেড নিউটন জন বাণমারা ছবি আঁকেন। তুকতাক, মারণবিদ্যা তাঁর ছবির উপকরণ। এই সব কথা ওঠার পিছনে

কিছুটা অবদান ছিল স্বয়ং টার্নারেরও, কারণ তিনি নিউটন জনের মধ্যে এক ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শনাক্ত করেছিলেন। আর তিনি রুষ্টও হয়েছিলেন নিউটন জনকে 'ড্রইং রুমের টার্নার' বলে বর্ণনা করায়।

জীবনে বীতশ্রদ্ধ নিউটন জন এরপর আত্মহত্যা করেন। মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে। তার আগে তাঁর সব কাজ পুড়িয়ে ফেলেন। ওরা পায় শুধু 'দ্য আনএণ্ডিং পার্টি', যেটি তাঁর প্রেয়সীর বাড়ি থেকে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। কারও কারও ধারণা, সেই প্রেয়সীর খানসামা টোনি হ্যারিককে ছবিটা তিনি নষ্ট করতে দেন, কিন্তু হ্যারিক সেটি নিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই পাড়ি দেন ভারতে। সেই থেকে ইংল্যাণ্ডের বিশ্রুত, বিতর্কিত ব্ল্যাক আর্ট ছবিটি নিখোঁজ।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে অরুণ ড্রাইভারকে বলল স্টেনরের নিলাম অফিসে নিয়ে যেতে। পৌঁছেই ম্যানেজারকে ধরল অরুণ : যে করেই হোক ছবিটা আমার চাই। ওর জন্য আমি তিরিশ হাজার টাকা দাম দেব। বাবার কালেকশন ওই ছবি নিলাম করে মস্ত ভুল করেছি।

ম্যানেজার ক্লান্তভাবে চোখ তুলে বলল, একটু দেরিই করলেন মনে হচ্ছে।

-মানে?

–আমার ফ্রেমার গিয়েছিল আরবুথনট সাহেবের বাড়িতে কাল বিকেলে। সাহেব নতুন ফ্রেম করবেন বলেছিলেন ছবিটার। কিন্তু...

উত্তেজনা চাপতে না পেরে অরুণ বলল, কিন্তু?

তিনি আর নেই। মিসেস আলবুথনটের বক্তব্য, রাতে ছবিটা স্টাডি করতে করতে সাহেবের হার্ট অ্যাটাক হয়।

—আর ছবিটা?

—মিসেস আরবুথনট ওটা ইংল্যাণ্ড নিয়ে যেতে চান। জানি না, আপনার ব্যাপারটা শুনলে আর ভালো দাম পেলে দিয়েও দিতে পারেন। চান? ফোন করব?

অরুণ কী একটা ভাবল কিছুক্ষণ, তারপর দ্বিধাজড়িত গলায় বলল, না, থাক। মনে মনে ভাবল, দু-বার দুর্ঘটনা থেকে বেঁচেছে ও, তৃতীয়বার অত সৌভাগ্যবান নাও তো হতে পারে। ওঁর বরাদ্দ মৃত্যুটাই যে আরবুথনটের কপালে ঠেকল না, কে বলতে পারে? তার চেয়ে আপদ বিদেয় হওয়াই শ্রেয়। ইংল্যাণ্ডের ব্ল্যাক আর্ট ইংল্যাণ্ডেই ফিরুক, টিঙ্কুর ঘরে বরং দুফি-র নিরাপদ প্রিন্ট ঝুলুক!